রাস্তায় যে হেঁটে যায়

শঙ্কর সেনগুপ্ত

অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ই নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

‘লেখক ও লেখা’—কিছু কথা

প্রথমেই বলে রাখা ভালো শঙ্কর সেনগুপ্ত দীর্ঘ কাল, অর্থাৎ প্রায় অর্ধশতকের অধিক সময় জুড়ে বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। আর এই সম্পৃক্ততা রাজনীতি বহির্ভূত হতে পারে নি। তবে এই সময়ের অনেক গল্পকার ও লেখক রাজনীতিকে হয়তো একটু আলতোভাবে, একটু দূর থেকে, দেখে থাকেন, শঙ্কর সেনগুপ্ত ঠিক সেভাবে রাজনীতিচর্চা করেন নি। কর্মজীবনে তিনি ব্যস্ত ছিলেন ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের সহকর্মীদের সঙ্গে সমবেতভাবে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলনে। তাই সারাজীবন একই জায়গায় চাকরি করেছেন, কোনো প্রমোশন নেন নি। প্রমোশন না নেবার কারণ একটাই, উচ্চপদে থাকলে তিনি শাসকদের অংশীভূত হয়ে যাবেন। আর এই জীবন ও যাপন থেকে একটি সত্য বেরিয়ে আসে, তিনি আর পাঁচজন চাকুরিজীবীর মতো দিনগত পাপক্ষয় করতে চাননি শুধু নয়, পারেননি। কারণ, তিনি ভুলতে পারেন নি দেশভাগের যন্ত্রণা। পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলার বাড়িঘর ছেড়ে প্রাণ হাতে নিয়ে দেশ ছাড়ার কথা। সেই বাল্যবয়সের বীভৎস অভিজ্ঞতা তাকে তাড়িত করেছেন সারাজীবন। সেই সময় রাতের পর রাত শিয়ালদহ স্টেশনে তাঁকে সপরিবারে বাস করতে হয়েছে। তারপর ভাগ্যক্রমে থিতু হতে পেরেছিলেন পশ্চিম বাংলায়। পেয়েছিলেন আকাশে ওড়া ও ওড়ানোর চাকুরি। কিন্তু নিজে সেই কল্পনার নীল আকাশে উড়ে যান নি। নিজে ভালো থাকবো এই চূড়ান্ত স্বার্থপর জীবন তিনি মানতে পারেন নি।

তাই ১৯৬৮ সালের বসন্তের বজ্রনির্ঘোষে কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন তিনি। সেই আন্দোলনে নীরব সমর্থন যুগিয়ে গিয়েছেন, কারণ সমাজ বদলের শপথ ছিল তার মনের মণিকোঠায়। পরে হয়তো বুঝতে পারছিলেন, যা হবার নয়, তা হতে পারে না। কিন্তু আন্দোলনের সহযাত্রীদের জন্য তাঁর সমানুভূতি আজো অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে।

শঙ্কর সেনগুপ্তর জীবনচর্যার কথা না বললে তাঁর লেখা বোঝা যাবে না। কিশোরকাল থেকে তাঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়তে হয়েছে। সচ্ছল মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীদের প্রতিবাদী করে গড়ে তোলা কত কঠিন তা, তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন।

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি 'অনুষ্টুপ' পত্রিকার সংস্পর্শে আসেন এবং পরে সম্পৃক্ত হন। এই পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্তির ক্ষেত্রটি তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে রক্ষা করে গিয়েছেন। বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা বন্ধুদের বিচ্যুতি দেখলে তিনি হয়তো উত্তেজিত হন, গাল পাড়েন; কিন্তু অতীতের দিনগুলির কথা ভাবলে, তিনি বুঝতে পারেন, কেন ঘটছে তার চেনা মানুষদের এই অধঃপতন। ক্ষমা করতে পারেন না। এই অশীতিপর বয়সকালেও তাঁর ক্রোধের তীব্রতা কমে নি।

তাই তিনি লেখেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! লেখার সময় তিনি বাস্তবকে ঠান্ডা মাথায় চুল চেরা বিশ্লেষণ করেন। যৌক্তিকভাবে বুঝতে যেমন চান, বোঝাতেও চান। তাঁর প্রথম গল্প সংকলন *বোকা বুড়োর ছেলেরা* সত্তরের সময়ের অনেক চরিত্রের ও তাদের বৈচিত্র্যের কথা বলে। এরকম একটি গল্পে তিনি বিপ্লবী স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তানের গল্প বলেন। বিপ্লবী চরিত্রের বাবার কথা উঠে আসে। তিনি তাঁর পুত্রকে বোঝান, দেশের জন্য লড়তে হলে সংসার জীবনে স্ত্রীপুত্রকে নিয়েই সেই লড়াই লড়তে হবে। তাঁদের ভালোবাসার ফসল সন্তানের দায়িত্ব সেই সংগ্রামের অংশ। সে দায়িত্ব অবহেলা করে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেশের জন্য লড়াই করা যায় না।

লেখক শঙ্কর সেনগুপ্ত জানেন, কোথায় সেই বিংশ শতকের সত্তরের দশক, আর কোথায় একবিংশ শতকের বিশের দশকের এই মাঝামাঝি সময়। কিন্তু জীবন পথের পথিকের পথ চলা তবু কখনো বিরাম পায় না। এই চলমান জীবনের বাস্তবতার কাহিনি বিধৃত হয়েছে এই ছোট্ট উপন্যাসে।

অনিল আচার্য

১৩.১১.২০২৫

রাস্তায় যে হেঁটে যায়

রজত হাঁটছিল। কলকাতার রাস্তায় রজতের হাঁটতে ভীষণ ভালো লাগে। যদিও হাঁটা আজকাল আর স্বস্তিদায়ক থাকছে না, কারণ রাস্তা বা ফুটপাথ ক্রমশ দুর্গমপথে পরিণত হচ্ছে। সামনেই কর্পোরেশনের নির্বাচন। রাস্তার পাশে পাশে পাথরকুচি পড়তে শুরু করেছে। আলকাতরার টিন জায়গায় জায়গায় জড়ো হচ্ছে। অ্যাসফল্ট ইতস্তত পড়ে থাকছে। রজত বোঝে কয়েকদিনের মধ্যে রাস্তা সারাই শুরু হবে ও কলকাতা শহরের দেয়ালগুলি টেকনিকলারে সেজে উঠবে।

যাগ্‌গে সে কথা। রজত হাঁটতে ভালোবাসে। কিন্তু ওর ওই যে প্রায়শই হাঁটা, মানে যখন ওর ভালো লাগছে না তখন হাঁটা—তার একটা বিশেষ কারণ, এক অখণ্ড সময় অজগরের মতো পড়ে আছে। ও কি করবে—ওর যে আজকাল বিশেষ কিছুই করার থাকে না! এই যে রজত আজ হাঁটছে, সেলিমপুর থেকে বেহালার চৌরাস্তা অবধি হেঁটে যাবে এটার কোনোই প্রয়োজন নেই। আজকাল কত নূতন নূতন বাস, অটো হয়েছে—সেলিমপুর, যাদবপুর থেকে বেহালার দিকে। কিন্তু ও জানে ওর বাড়ি গিয়ে কিছুই করার নেই। তাই অন্যান্য দিনের মতো আজও হাঁটা শুরু করেছে।

কিন্তু আজ মনটা ভীষণ ভারাক্রান্ত। স্কুল ছুটি হয়ে গেল। গরমের ছুটি একমাস বারোদিন। এই একমাস বারোদিন রজতের কাছে এক ভয়াবহ নরকের দিন হয়ে উঠবে। অন্যান্য দিনগুলি যদি নরকের দিন হয়ে থাকে তবে ভেকেশানের এই দিনগুলি ওর কাছে ভয়াবহ নরকের দিন হয়ে ওঠে।

রজতদের একটা ঠেক আছে। বাইপাসের গায়ে টালি দেওয়া মোটামুটি একটা প্রশস্ত ঠেক। এখানে রজত ছাড়া আরো কয়েকজন বন্ধু আছেন। এটা একটা বিচিত্র ঠেক। প্রাক্তন সম্মেলনীর মতো প্রাক্তনদের ঠেক। এখানে বিবিধ রত্নরাজি মানে বিবিধ প্রাক্তন কংগ্রেস, প্রাক্তন নকশাল, প্রাক্তন সিপিআই, প্রাক্তন

আরএসপি, প্রাক্তন এসইউসি ও কিছু প্রাক্তন সিপিএমের একদল মোহমুক্ত টাইপের মানুষের সম্মেলন। বেশ কিছু বর্তমান, মানে লোকজনও আছে। এমন কি বিজেপি-রও দুই-এক পিস আছে। যাকে বলা যায় ব্রডেস্ট পসিবল ইউনিটি। রজতের ভাবনায় মনে হয় ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্টীয় কায়দায় বা মাওয়ের নয়া গণতন্ত্র টাইপের আর কি। এই বিচিত্র ঠেকটি রজতের নিজস্ব আশ্রয়। ৮০ সালের পর থেকেই এটা গড়ে উঠেছে, কিছুদিনের মধ্যে বিভিন্ন সংকটের মুখোমুখি হয়েও এটা টিকে তো গেছেই; উপরন্তু দিন-কে-দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সকলেই প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছে, অবশ্যই বিভিন্ন কৌতূহল দ্দীপক ব্যাখ্যায়, যে এটা একটা অতিগণতান্ত্রিক মহাবোধি আস্তানা। অতি সাম্প্রতিককালে এই ঠেকটার কিছুটা দুঃসময় চলছে। আর তাতেই রজতের নরকের দিনগুলি আরো করুণতম হয়ে ওঠছে।

আসলে ঠেকটার মোহন্ত যারাই হয়ে থাকুক না কেন, দিনান্তের শেষে কিঞ্চিৎ সোমরসে জারিত হয়ে গোলটেবিল যতই চলুক না কেন, দোকানটা সকলের কমন বন্ধু গোরা নস্কর। গোরা একা ছোট্ট চায়ের দোকান চালাত। তখনও গোরার কারখানা চালু ছিল। একদিন ভোরের শিফ্‌টে কারখানা গিয়ে ফিরে এল। বিশাল তালা ঝুলছে। কারখানা লকআউট হয়ে গেল। সেই রাত্রেই ঠিক হল , প্রাক্তনীরা একত্রে সিদ্ধান্ত নিল—এখানে গুলের দোকান হবে। গোরা গুলের দোকান চালাবে। মূলধন আমরাই জোগাব, যতক্ষণ না গোরা মূলধন তৈরি করতে না পারে। খালি মোহন্তদের আবেদন, আমরা সন্ধ্যার দিকে একটু জারিত হব। গোরা বলল, 'সেটা তো ভায়া এমনিতেই হচ্ছিল, ওটা তো কোনো নূতন ব্যাপার হবে না।'

মূলধন পাঁচহাজার টাকা জোগাড় হয়ে গেল। পরের দিনই সন্ধের সময় সাইনবোর্ড টাঙানো হল, 'গোরার গুলের দোকান'। পরিচিত যারা এখনও ইন্ডেন গ্যাসে আহ্লাদিত হননি, সকলেই গোরার দোকানে চলে এল। কারখানা বন্ধের এই গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে গোরা বেঁচে থাকার মতো খানিকটা রসদ জোগাড় করার সম্ভাবনা তৈরি করে নিল।

গোরার দোকানের পাশে আরো একটা টালির শেড ছিল। সেটা ছিল দুর্ধর্ষ দিবাকরের। মূলত সাতাত্তর সালে জেল থেকে বেরিয়ে আসার পরই দিবাকর এই জমিগুলি দখলের নেতৃত্ব দেয়। দিবাকর নিজের জমির ওপর একটা শেডই